উত্তরঃ ভূমিকা : 'উদাসীন পথিক'রূপি মীর মশাররফ হোসেন [১৮৪৭-১৯১১] ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলমান গদ্য শিল্পী। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-১৮৯১ রচনাকাল)। মধ্যযুগীয় ধর্মচেতনার জীবন বিমুখ আচ্ছন্নতাকে অপসারিত করে ইহলোকের ইন্দ্রিয় পরবশ মানব-মানবীর হর্ষলোকের মহামূল্যকে তিনি যে কল্পলোকের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন সেটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মীর মশাররফ হোসেন যদিও মহাকাব্য রচনা করেননি– তবু একথা অনস্বীকার্য যে, 'বিষাদ-সিন্ধু'র পরিকল্পনায় দৈনন্দিন তুচ্ছতার অতীত মহাকাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি লক্ষণীয়। ঐতিহ্যপূর্ণ এবং প্রথাগত কারবালার বিষাদময় কাহিনিকে তিনি 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থে গঠন কৌশলের দক্ষতায় প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের গঠনকৌশল/ শিল্পমূল্য/ সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য : 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য: 'বিষাদ-সিন্ধু'র পটভূমিতে নির্বাচনে লেখকের সচেতন শিল্পী মানসের পরিচয় দিয়েছে। যে বিশাল পটভূমিতে রচিত হলে সাহিত্য সমুদ্রে মহাসমুদ্রের কল্লোল ধ্বনি শোনা 'বিষাদ-সিন্ধু'তে তাই উঠে এসেছে। 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মেঘনাদবধ' কাব্যেই এ ধরনের বৃহত্তর পটভূমি প্রত্যক্ষ করা যায়। 'বিষাদ-সিন্ধু'তে আছে মহকাব্যের বিশাল পটভূমিকা। এখানকার সংঘর্ষ ব্যক্তিগত সংঘর্ষের কাহিনি এ হচ্ছে ক্ষমতার প্রশ্নে দুই নৃপতির মধ্যে সংঘর্ষ। এ সংঘর্ষের সঙ্গে জড়িত ছিল বহুকালের জীবন ও ভাগ্য। এ গ্রন্থে প্রায় শ-খানেক পাত্র-পাত্রী আছে, এর মধ্যে আছে অনেক কাহিনি- যা আবার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত। হিংসা-বিদ্বেষ জর্জরিত মানুষের কামনা-বাসনা, প্রভুত্বের জন্যে ষড়যন্ত্র, নিষ্ঠুরতা, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এসব ঘটেছিল একটি নারীকে কেন্দ্র করে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নিয়তিবাদ।

'বিষাদ-সিন্ধু'র কাহিনি তিন পর্বে বিভক্ত। যথা : মহররম পর্ব-১৮৮৫, উদ্ধার পর্ব-১৮৮৭, এজিদ বধ পর্ব-১৮৯১। গ্রন্থটির উপক্রমণিকা এবং উপসংহার অংশ ব্যতীত মোট একষট্টি অধ্যায়ে বা প্রবাহে বিভক্ত। 'বিষাদ-সিন্ধু'তে কবি কল্পনা ও কল্পনাশক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। লেখক 'বিষাদ-সিন্ধু'র পরিচ্ছেদসমূহকে 'প্রবাহ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো পরিচ্ছেদের অন্তর্গত অংশে এসে বলেছেন 'তরঙ্গ'। যেমন– "পূর্বেই বলিয়াছি যে, মহাবীর কাসেমের ঘটনা 'বিষাদ-সিন্ধু'র একটি প্রধান তরঙ্গ।" (মহররম পর্ব-২৫) কিংবা, "এ প্রবাহ না লিখিলে কী 'উদ্ধার পর্ব' অসম্পূর্ণ থাকিত, না 'বিষাদ-সিন্ধু'র কোনো তরঙ্গের হীনতা জন্মিত?" (উদ্ধার পর্ব-১৪) 'বিষাদ-সিন্ধু'র কাহিনিতে আছে কারবালা প্রান্তরের বিষাদময়তা যা ঐতিহাসিকভাবে সত্য এবং গ্রন্থটির কাহিনি বিন্যাসে প্রচলিত পুঁথি সাহিত্যের বিস্তৃত প্রভাব। 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে প্রেম বর্তমান। 'বিষাদ-সিন্ধু'তে উপন্যাসগুণ সর্বাধিক বিকাশ লাভ করেছে এজিদ ও জায়েদা চরিত্র দুটিকে অবলম্বন করে। একজন আধুনিক ঔপন্যাসিকের মতোই মশাররফ এজিদ ও জায়েদা চরিত্র অঙ্কন করেছেন এবং এ চরিত্র দুটির বিকাশ দেখিয়েছেন। এজিদ অন্তরের অপ্রতিরোধ্য রূপতৃষ্ণা এ উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। এজিদের অন্তরের অপ্রতিরোধ্য রূপতৃষ্ণা 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসকে গতিশীল করেছে। জয়নাবের রূপের প্রতি এজিদের প্রচণ্ড আকর্ষণ তা বাস্তবায়নের ব্যর্থতায় এজিদ ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পরিণামে ইমাম হাসানকে কৌশলে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে এবং ইমাম হোসেনকে ষড়যন্ত্র করে কারবালা প্রান্তরে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। কারবালার যে আবেগ অনুভূতি বাঙালি মুসলিম সমাজে বিদ্যমান তার সূত্র ধরে লেখক 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থে সে আবেগের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন শৈল্পিকমূল্যে। মধুসূদনের কাব্য কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পুরাণ বা ইতিহাসের উপাদানকে শিল্পের মন্ত্রে নতুন অভিধায় উজ্জীবিত করেছে, সেই অর্থে 'বিষাদ-সিন্ধু' ইতিহাস নয় স্বতন্ত্র সৃষ্টি। মীর মশাররফ হোসেন শিল্পীমানস গঠনে বঙ্কিমের রোম্যান্স, মদুসূদন দত্ত এর কল্পনার ব্যাপ্তি ছিল- যা 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থে উপস্থাপিত।

'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসটির রচনারীতির ক্ষেত্রে লেখকের আরেকটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষণীয়– প্রথম সুযোগেই অবিলম্বে পাঠকচিত্তের সাথে অন্তরঙ্গতার যোগসূত্র স্থাপনে তিনি ব্যগ্র। এ আত্মীয়তা স্থাপনের ফলে অতি সহজেই পাঠক স্বয়ং সমগ্র কাহিনির অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। অতঃপর ঘটনাপ্রবাহের বিচিত্র উত্থানপতন, চরিত্রসমূহের দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংকট, জয়নাব জয়ের সাথে পাঠকের চিত্ত সমভাবেই আন্দোলিত হতে থাকে। এ উপন্যাস হয়ে উঠে পাঠকের সুখদুঃখ, আনন্দ বেদনার কাহিনি, আর এখানেই ঔপন্যাসিক হিসেবে লেখকের কৃতিত্ব।

'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের চরিত্রায়ণ-কৌশল : 'বিষাদ-সিন্ধু' মীর মশাররফ হোসেন-এর পরিণত বয়সের রচনা। তিন পর্বে বিভক্ত এ উপন্যাস সাত বছর ধরে রচিত এবং প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম পর্ব প্রকাশের সময় লেখকের বয়স ছিল ছত্রিশ, শেষ পর্ব প্রকাশের কালে বিয়াল্লিশ। একজন শিল্পীর জীবনে বলা যেতে পারে এটাই শ্রেষ্ঠ সময়। তাই লেখক অসংখ্য চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে 'বিষাদ-সিন্ধু'কে নানামাত্রিক মূল্যে রূপদান করেছেন। ফলে 'বিষাদ-সিন্ধু' হয়ে উঠেছে চরিত্র প্রধান উপন্যাস। চরিত্রগুলো আবার দু'ভাবে বিভক্ত- একদিকে রয়েছে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বংশধরগণ যারা ন্যায় ও মহত্ত্বের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত- অন্যদিকে মারোয়ান, এজিদ, আব্দুল্লাহ জেয়াদ, সীমার-এর মতো পাষণ্ড চরিত্র। লেখক অত্যন্ত যত্নসহকারে এসব চরিত্র নির্মাণ করেছেন।

এজিদ চরিত্রাঙ্কনে লেখক মানবিক আবেগ এবং অনুভূতির আরোপ করেছেন। এজিদের অন্তরের অপ্রতিরোধ্য রূপতৃষ্ণা 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। এজিদের মনোদুঃখের সঙ্গে 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের সূত্রপাত এবং ট্র্যাজিক পরিণতিতে এর সমাপ্তি। এ চরিত্রের বিন্যাসে লেখক রক্তমাংস সমন্বিত একজন মানুষের চিত্র এঁকেছেন– যার মধ্যে দোষ-ত্রুটি-মন্দ লাগা-ভালো লাগা বিদ্যমান।

এজিদ চরিত্রের পর যে চরিত্রটিতে মানবিক আবেদন আরোপিত হয়েছে তা হচ্ছে জায়েদা চরিত্র। তিনি ইমাম হাসানের দ্বিতীয় চরিত্র। সে স্বামী হাসানকে বিষপানে হত্যা করে। জায়েদা চরিত্রাঙ্কনে লেখকের পারিবারিক অভিজ্ঞতার চিহ্ন স্পষ্ট। এ চরিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক সপত্নীবাদের বিরুদ্ধে তার ঘৃণা এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

মারোয়ান এজিদের মন্ত্রী এবং সেনাপতি। মাবিয়ার জীবিতকালেই এজিদের দক্ষিণহস্ত এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এজিদের অনুসারী ছিল। মায়মুনা দাসী রূপে এক পাষণ্ড নারী চরিত্র। প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এ চরিত্রটি সৃষ্টি হয়েছে।

মুহাম্মদ হানিফা হযরত আলীর সন্তান এবং একজন সাহসী পুরুষ। দৈববাণী অলঙ্ঘ্য জেনেও এজিদ হত্যার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'বিষাদ-সিন্ধু'র সমস্ত ঘটনা জয়নবকে কেন্দ্র করে হলেও তার চরিত্রের বিকাশ লক্ষ করা যায় না। এজিদের জন্যেই গ্রন্থের বিশাল আয়োজন। একজন মানুষ হিসেবে লেখক অন্যায় করে হোসেনের মৃত্যুতে তিনি ব্যথিত, বেদনাতুর আবার শিল্পী হিসেবে এজিদ চরিত্রের বিচিত্র সম্ভাবনা উপেক্ষা করতেও অপারগ।

এছাড়া যেসব চরিত্র 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে তা হলো আব্দুল্লাহ জেয়াদ, আব্দুল জব্বার, আক্কা, ওতবে ওলীদ, মোসলেম, মাবিয়া পত্নী, কাসেম, সখিনা, সীমার, বিবি সালেহা উল্লেখযোগ্য।

'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থটি জনপ্রিয়তা অর্জনের পেছনে শুধু এর বিষয়বস্তুগত নয়। এর ভাষার অপূর্ব উন্মাদিনী শক্তি, অপরূপ সঙ্গীতময়তা ও স্বচ্ছ সাবলীল প্রবাহ। বস্তুত ঐতিহাসিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে 'বিষাদ-সিন্ধু'র শ্রেষ্ঠ সম্পদ এর অপরূপ ভাষাশৈলী। উল্লেখ্য 'বিষাদসিন্ধু'র মহররম পর্বের ভূমিকায় মশাররফ হোসেন তাঁর ভাষা সম্পর্কে বলেন–

"শাস্ত্রানুসারে পাপ ভয়ে ও সমাজের দৃঢ় বন্ধনে বাধ্য হইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু'র মধ্যে কতকগুলো জাতীয় শব্দ ব্যবহার করতে হলো। বিজ্ঞমণ্ডলী হতে যদি কোনো প্রকার দোষ বিবেচনা করেন, সদয়ভাবে মার্জনা করবেন।"

'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রথম খণ্ড (মহররম পর্ব) প্রকাশিত হওয়ার পর বেশ কয়েকটি পত্রিকায় এ গ্রন্থের ভাষা সম্পর্কে মতামত প্রকাশিত হয়। কাঙ্গাল হরিনাথ 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় মন্তব্য করেন- 'মুসলিমদিগের গ্রন্থ এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।'

'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের ভাষা-ব্যবহার : 'বিষাদ-সিন্ধু' সাধু ভাষায় রচিত। সমস্ত ক্রিয়াপদগুলোই সাধু ভাষায়। এতে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়। মুসলিম জীবনের বিষয় নিয়ে কাহিনি রচনা করতে গিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে কিছু আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ করেছেন। 'বিষাদ-সিন্ধু'র আনুমানিক শব্দ সংখ্যা ১২,৭,০০০-এর মধ্যে ২০০ কিংবা তার চাইতে কিছু বেশি সংখ্যক আরবি-ফারসি শব্দ (পুনরুক্তি ছাড়া) ব্যবহার করা হয়েছে।

কবিতার মতো গদ্যেও রয়েছে এক প্রকার ছন্দ। এ ছন্দই গদ্যকে করে তোলে কাব্য-সুষমামণ্ডিত। 'বিষাদ-সিন্ধু'তে এ ধরনের গদ্য ছন্দের প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। 'বিষাদ-সিন্ধু'র ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর সংগীতধর্মিতা। এর ভাষায় একটি সুষম সংগীত মাধুর্য প্রবহমান। গদ্য ভাষার অন্তর্লীন সংগীত প্রবাহ গ্রন্থটিকে বহুলাংশে কাব্য সৌন্দর্য দান করেছে। কল্পনা এবং যথাযথ শব্দ ব্যবহারের ফলে 'বিষাদ-সিন্ধু'র ভাষা কখনো কখনো সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতায় এমন সুষমামণ্ডিত হয়ে ফুটে ওঠে যে, একে তখন ভাস্কর্যের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। যেমন–

"ইশ্বরের মহিমার অন্ত নেই। একটি সামান্য বৃক্ষপত্রে তাঁহার শত সহস্র মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। একটি পতঙ্গের ক্ষুদ্র পালকে তাঁহার অনন্ত শিল্পকার্য বিভাসিত হইতেছে। অনন্ত বালুকারাশির একটি ক্ষুদ্র বালুকণাতে তার অনন্ত করুণা আঁকা রহিয়াছে।"

চলো শিখি

কখনো আবার কাব্যধর্মিতায় এ ভাষা আবেগনির্ভর গদ্যের নমুনা হয়েছে–

"এখন এজিদের চক্ষে জল নাই। তাঁহার বিশাল বিস্ফারিত যুগলচক্ষে এখন আর জল নাই।...যদি কিছু পড়িবার হয়, যদি এজিদের অক্ষিদ্বয় হইতে এইক্ষণে কিছু পড়িবার থাকে, তবে কি পড়িবে?..না, না, না, সে জল নহে। যে দুই এক ফোঁটা পড়িবে, সে দুই এক ফোঁটা জল নহে- জল হইবার কথা নহে।"

'বিষাদ-সিন্ধু'র ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর সংগীতধর্মিতা। এর গদ্যে যে সংগীতময়তা অন্তর্নিহিত, যে ছন্দ স্রোত সুষম যতিবিন্যাসের ফলে তা মাধুর্যমণ্ডিত এবং বেগবান। গ্রন্থের সর্বত্র তার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি নিদর্শন :

"হোসেন সকরুণ স্বরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সঙ্গীগণকে বলিতে লাগিলেন, "ভাইসকল, হাস্যপরিহাস দূর কর; সর্বশক্তিমান জগৎনিদান করুণাময় ঈশ্বরের নাম মনে কর। আমরা বড় ভয়ানক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই স্থানের নাম করিতে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে, প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে।" (মহররম পর্ব-২৪)

'বিষাদ-সিন্ধু'র আখ্যান ইতিহাসের এক ট্র্যাজিক অধ্যায় থেকে আহূত চরিত্রসমূহের অবস্থান স্থান কালাতীত লোকে এবং কাহিনির হৃদয়াভ্যন্তরে যে মর্মভেদী হাহাকার সে শুধু হোসেন পরিবারের শোক নয়, এ শোক অসংখ্য মানুষের, যুগে যুগে তা প্রবহমান। কাজেই ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে লেখক শব্দ নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিম, বিদ্যাসাগরের মত তৎসম শব্দভাণ্ডারের দ্বারস্থ হয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসের তৎসম শব্দবহুল বাক্য রচনার নিদর্শন :

"নগরের উচ্চ উচ্চ প্রাসাদে, অত্যুচ্চ মঞ্চে, সিংহদ্বারে, নানা স্থানে অনন্ত শোক প্রকাশক নীল পতাকা সকল অনিল সহকারে অনন্ত নীলাকাশে মিশিয়া হোসেনের অনন্ত শোক কাঁপিয়া কাঁপিয়া প্রকাশ করিতেছে। যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, সেদিকেই শোকের চিহ্ন, বিষাদের রেখা। ..... হায়! হায়! হোসেন শোকের অন্ত নাই, এ বিষাদ সিন্ধুর শেষ নাই।"

অলংকার প্রয়োগে মীর মোশাররফ তেমন অভিনবত্ব দেখাতে পারেননি। তবে তিনি বাংলা গদ্যের ভিত্তি নির্মাণে শ্রী ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর বাক্য সজ্জায়, পদ গুচ্ছের অবস্থানে, খণ্ড বাক্য সজ্জায়, উক্তিধর্মী বাক্য রচনায়, নিত্যসম্বন্ধী ও পরস্পর সম্বন্ধী শব্দযুগলের ব্যবহারে বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি তথা বঙ্কিমী গদ্যরীতির সফল অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। এসব ক্ষেত্রে মীরের কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। বাক্য সজ্জা ও শব্দ সজ্জায় তাঁর স্বোপার্জিত নৈপুণ্য ছিল তা স্বীকার করতেই হবে।

উপসংহার : 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসটির রচনারীতির ক্ষেত্রে লেখকের আরেকটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষণীয়– প্রথম সুযোগেই অবিলম্বে পাঠকচিত্তের সাথে অন্তরঙ্গতার যোগসূত্র স্থাপনে তিনি ব্যগ্র। এ আত্মীয়তা স্থাপনের ফলে অতি সহজেই পাঠক স্বয়ং সমগ্র কাহিনির অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। অতঃপর ঘটনাপ্রবাহের বিচিত্র উত্থানপতন, চরিত্রসমূহের দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংকট, জয়নাব জয়ের সাথে পাঠকের চিত্ত সমভাবেই আন্দোলিত হতে থাকে। এ উপন্যাস হয়ে উঠে পাঠকের সুখদুঃখ, আনন্দ বেদনার কাহিনি, আর এখানেই ঔপন্যাসিক হিসেবে লেখকের কৃতিত্ব। এ-উপন্যাসে ঐতিহাসিক উপাদানের সাথে মিশেছে লেখকের জীবনমুখী সৌন্দর্য দৃষ্টি এবং ঔপন্যাসিক শিল্পচেতনা। এর ওপর পর্ব এবং প্রবাহে রোম্যান্সের আকর্ষণীয় আবির্ভাবের সাথে মিশেছে ঘটনাবহুল নাটকীয়তা। ফলে সমগ্র গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে দুর্বার গতিসম্পন্ন এক মহান উপন্যাস।